৭ মার্চ উপলক্ষ্যে বিশেষ ফিচার

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব-ঘোষণা ও অভিযাত্রা

অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯ মিনিটের যে ভাষণটি প্রদান করেছিলেন , তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের জন্যই শুধু নয়, পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সেই সময়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ , ইতিহাস নির্মাণ এবং সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুত করার এক অদ্বিতীয় রাজনৈতিক তাৎপর্যমন্ডিত ঘোষণার দলিল হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। সেকারণেই প্রতিবছর ৭ মার্চ তারিখটি বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে ফিরে আসে । ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত এই ভাষণটি পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে স্বাধীনতার আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার এক বিস্ময়কর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলো। ২৫ মার্চ তারিখে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামিয়ে যে গণহত্যা শুরু করেছিলো তা রুখে দিতে এবং স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করতে বঙ্গবন্ধুকে ৭ মার্চের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি। । এখান থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতা দীর্ঘ ৯ মাস এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়। সেকারণে ৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর দরাজ কণ্ঠ থেকে সেদিন যে ভাষণটি উচ্চারিত হয়েছিলো তা সমাগত লক্ষ লক্ষ জনতাকে এতোটাই আবিষ্ট করেছিলো যে নেতা বঙ্গবন্ধু এবং জনতা যেনো একাকার হয়ে উঠেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যেনো জনগণের প্রাণের কথা। জনগণ নেতা বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় কণ্ঠের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে থাকে। নেতা বঙ্গবন্ধুও জনতাকে তার আবেগ, ভালোবাসা এবং তাদের চাওয়া পাওয়া বাস্তবে রূপ দেওয়ার কঠিন চ্যালেঞ্জকে রাজনীতির পথে এগিয়ে নেওয়ার রাস্তা প্রদর্শন করলেন। তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যেমন সুগঠিত ছিলো তেমনি ইতিহাসের পথ মাড়িয়ে আসা এক নির্জলা আন্দোলন সংগ্রামের পথ বেয়ে আসা ইতিহাস তাতে উপস্থাপিত হচ্ছিলো। যেখানে শোষণ-বঞ্চনা, আত্মত্যাগ, রক্তপাত ঘটেছিলো নিরীহ , নিরস্ত্র, বুভুক্ষু মানুষের ওপর, যা ছিলো বাঙ্গালির ওপর পাকিস্তানিদের শাসন- শোষণ টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে । ভাষণে তিনি জনগণের অধিকার কীভাবে বার বার লঙ্ঘিত হয়েছিলো, পূর্ব বাংলার জনগণ কীভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে একের পর এক অমানবিক আচরণ এবং আঘাত পেয়েছিলো, সেটি তিনি জাতির নেতা হিসেবে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তার বর্ণনাও দিয়েছেন। ভাষণে ২৩ বছরের পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা ও বাঙ্গালির অস্তিত্বের অবহেলার ও দুঃশাসনের চিত্র তিনি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই অবস্থায় একজন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান নেতা হিসেবে তার অনুভূতির প্রকাশ এই ভাষণের ছত্রে ছত্রে তিনি প্রকাশ করেছিলেন । উপস্থিত জনতা তার সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করছিলো এবং সমর্থন জানিয়েছিলো পরবর্তী করণীয় নির্দেশনার প্রতি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণের শুরুতেই জনগণের প্রতি আস্থা রেখে বলেছিলেন, “আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। “ কারণ এই সময়ে যে আন্দোলন সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিলো তা যেমনিভাবে সবার জানা ছিলো একইভাবে সেই আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণও ছিলো স্বতঃস্ফুর্তভাবে। জনগণই একসময় ভোটের অধিকারের জন্য বঙ্গবন্ধুর দেওয়ার ৬ দফার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলো। গোটা জাতি তখন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো, সংগঠিত করেছিলো ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান আর তাতেই স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদায় নিয়ে শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতার হাতবদল ঘটিয়ে মনে করেছিলো জনগণের আকাঙ্ক্ষা দমন করা যাবে । কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র শেষপর্যন্ত টিকে নি। সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানকে দিতে হয়েছিলো। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ একাট্টা হয়ে যে রায় প্রদান করেছিলো তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি পূর্ববাংলার জনগণের মনোভাব প্রকাশিত হয়ে যায়। এটি বুঝতে পেরেই পাকিস্তানের সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করছিলো। ১ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া খান ৩ তারিখে শুরু হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার পর পূর্ববাংলা প্রতিবাদে জেগে উঠে। এখানে জনগণ সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলো। জনগণ ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে রাস্তায় নেমে আসে। এটিকে দমন করতেই গুলি করে হত্যা করা হয় নিরীহ প্রতিবাদকারীদের । সেকারণেই বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করলেন , “ আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। “ এখানেই বঙ্গবন্ধু জনগণকে ঘুরে দাঁড়ানোর যে আহ্বান জানালেন তাতে পাকিস্তানের প্রতি তার কঠোর মনোভাব এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছিলো । তার এই উচ্চারণ পূর্ববাংলার জনগণকে তখন অসীম সাহস যুগিয়েছিলো। মানুষ তাদের সম্মুখেই এমন একজন নেতাকে দেখতে পাচ্ছেন যিনি পাকিস্তানের ক্ষমতাধরদের মোটেও ভয় করেন না। জনগণ ২৩ বছরের শাসন, শোষণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা নেতাকেই তাদের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছেন। যার কাছে অধিকার আদায়ে নির্ভয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথাই

উচ্চারণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশা নতুন মাত্রায় জেগে ওঠে । যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে এতদিন জেগে উঠেছিলো সেটি বাস্তবে রূপ দেওয়ার নেতৃত্ব সেদিন সামনে দেখতে পেয়েছিলো মানুষ। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বঞ্চনার ইতিহাস রুখে দেওয়ার মাধ্যমে মুক্তির পথের কথা উচ্চারণ করলেন। এর জন্য তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন। কারণ নেতা জানেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতেই হবে। পাকিস্তানিরা ৭০ এর ভোটের পর পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানের নাগরিকের অধিকারের চোখে দেখতে চায়নি। তারা গণরায়কে ধূলিসাৎ করার জন্য জাতীয় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছে। কেনো না এই পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলে পূর্ববাংলার জনগণ পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। সেটি তারা কিছুতেই মেনে নিতে চায় নি। তাদের এই মেনে না নেওয়ার বিষয়টি পূর্ব বাংলার জনগণও মেনে নিতে পারেনি। সেকারণেই ১ তারিখ থেকে পূর্ববাংলা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো। হরতাল, অসহযোগ, স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন, "পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা " স্লোগান উচ্চারণে যে সাহসী ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো সেটি ছিলো পাকিস্তানের প্রতি অনাস্থারই বহিঃপ্রকাশ । সেই অনাস্থা মানে হচ্ছে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু জনমনের এই প্রস্তুতি ও পরিবর্তন লক্ষ্য করেই বলেছিলেন," তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। " এই কঠিন বক্তব্য উচ্চারনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বুঝিয়ে দিলেন যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাকে ৭ তারিখের পর অগ্রসর হতে নাও দিতে পারেন। কিন্তু নেতা জনতার আবেগ-উত্তেজনা, চাওয়া-পাওয়া এবং মনোভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই জনতা এখন আর পেছনের দিকে নয়, সম্মুখের দিকেই ছুটে যাবে অনির্বান গতিতে। সেকারণে তিনি উচ্চারণ করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এখানে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে যে বিষয়টি সবাইকে বলে দিলেন তা বুঝতে কারোরই বাকি রইল না। রাজনীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যকে দুটি ধারায় দেখতে হবে। প্রথমত, যেহেতু ৩ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন চলে আসছিলো। সে আন্দোলন ৭ তারিখের পর চালিয়ে নেওয়ার নির্দেশ বঙ্গবন্ধু দিলেন। তাই নিয়মতান্ত্রিক ধারায় অসহযোগ আন্দোলনের গতি যে পরিণতি নেবে তাতে সামরিক স্বৈরশাসকের ক্ষমতায় থাকার সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না। তাকে অবশ্যই ক্ষমতা ছেড়ে বিদায় নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে সূচিত অসহযোগ আন্দোলন শেষপর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ধারায় পাকিস্তানের পতন ঘটানোর কথা। কিন্তু ক্ষমতা না ছেড়ে যদি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তাহলে নিরস্ত্র জনগণের ওপর আঘাত হানা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ শাসকগোষ্ঠী বেছে নেবে না। সেক্ষেত্রে বাঙ্গালির ওপর আক্রমণ ঘটলে স্বাধীনতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার পাল্টা আক্রমণ অনিবার্য হয়ে উঠবে। বঙ্গবন্ধু এই দুটি পথই তার উক্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে খোলা রেখে দিলেন। সকলেই বুঝতে পারছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতিতে পাকিস্তানিরা ক্ষমতা ছাড়বে না, পূর্ববাংলাও ত্যাগ করবে না। সুতরাং দ্বিতীয় সশস্ত্র পথেই তারা জনগণের উত্থানকে দমন করতে চাইবে। সেকারণেই বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানালেন। কতো নিগূঢ় সত্য লুকিয়ে ছিলো বঙ্গবন্ধুর এমন তেজোদীপ্ত , প্রজ্ঞাদীপ্ত বজ্রকণ্ঠের মধ্যে। গোটা ভাষণের নির্যাসটি যেনো এখানেই এসে মানুষকে সশস্ত্র হওয়ার পথে নামিয়ে দিলো। তিনি ভাষণ শেষ করেছেন কিন্তু আন্দোলনকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে চড়িয়ে দিলেন । সেই পথ প্রতিদিন প্রশস্ত হতে থাকলো। পাকিস্তানিরা ঢাকায় এসে ফয়সালা করার চেষ্টা করলো কিন্তু ফয়সালার নিয়মতান্ত্রিক পথে তারা অগ্রসর হয়নি । ফলে ১৬ তারিখ থেকে ইয়াহিয়া খান আলোচনার টেবিলে বসে আসলে গোপনে অপারেশন সার্চলাইটের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু সাড়ে সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে প্রস্তুতি নিতে সময় দিলেন। ২৫ মার্চ তারিখ পাকিস্তানিরা অপারেশন সার্চলাইট নামিয়ে যে গণহত্যা শুরু করেছিলো তার পরিণতিতে তারা চেয়েছিলো পূর্ববাংলায় মানুষ নয় পোড়ামাটির বাস্তবায়ন। কিন্তু এই মাটি কতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো সেটি তারা উপলব্ধি করতে পারেনি, এই মাটির সন্তানরা অপারেশন সার্চলাইটের আগুন নিভিয়ে দিতে লক্ষ লক্ষ বুক চিতিয়ে দিয়েছিলো। সেই বুক ধারণ করেছিলো ৭ মার্চ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া তেজোদীপ্ত ভাষণকে । এটি ছিলো মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব স্বাধীনতার মন্ত্রে প্রজ্বলিত সাড়ে সাত কোটি মানুষের হাতে একেকটি অগ্নিশিখা।

যে নেতা জাতিকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে স্বাধীনতার মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে জানেন তিনি ইতিহাসের ক্ষণ , বাস্তবতা এবং স্বাধীনতা অর্জনের উপায়কে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়েই প্রদর্শন করেন। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার আলোকোজ্জিত পথ দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলেন না। কারণ অনিবার্য স্বাধীনতার জন্য আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই ৭ তারিখে স্বাধীনতার চূড়ান্ত নয় , নিকটবর্তী ঘোষণা উচ্চারণ করাই কেবল যেতে পারে। সেটিই তিনি সেদিন করলেন। যদি ৭ তারিখেই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দিতেন তাহলে পাকিস্তানিদের তাক করা ট্যাঙ্ক, বন্দুক, কামান, মেশিনগান রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর শুধু নয়, গোটা দেশের মানুষের ওপর নিক্ষিপ্ত হতো। তাতে নেতৃত্ব যেমন এক জায়গাতেই পাকিস্তানিদের হাতে নিহত হতো। নিরস্ত্র মানুষও তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারতো না। পাকিস্তান রাষ্ট্র বিশ্বকে বুঝিয়ে দিতো শেখ মুজিব স্বাধীনতাকামী নয় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো ছিলেন ২০ শতকের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেরা নেতা । তাই ৭ মার্চ তিনি জনতাকে নিয়ে স্বাধীনতার দীর্ঘ আন্দোলনের সঠিক পথে পদযাত্রা শুরু করলেন। এই যাত্রাকে সামরিক বাহিনী ২৫ তারিখ গণহত্যা চালিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলো, এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ন্যায্য প্রতিরোধ, জনতার জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়ে প্রতিউত্তর দেওয়া হলো। এই যুদ্ধই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলো। ৭ মার্চ স্বাধীনতার ইতিহাস

নির্মাণের এক ঐতিহাসিক পদযাত্রার দিন। সেই যাত্রার নেতৃত্ব দিলেন বঙ্গবন্ধু। কণ্ঠে ছিলো তার অমর এক রাজনৈতিক ভাষণ, যা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ দলিল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

#

লেখক : অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ

০২.০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার